মদনমোহন তর্কালঙ্কার

বিমলেন্দু সিংহরায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ লেখকের কথা ॥

বাংলায় অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি সম্পর্কে মূল্যবান লেখা বিশেষ করে তাঁদের জীবন সম্পর্কিত নানা তথ্য অনেক লেখকই নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। এই সব মহান ব্যক্তিসম্পর্কিত লেখা পড়ে আমরা বহুলাংশে উপকৃত। বিশেষ করে, মহামানবের শিক্ষা, কর্মজীবন, জীবনদর্শন পড়ে আমরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হই। বাংলার সুসন্তান, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, বাংলার শিশুশিক্ষার অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক, সুশাসক, কর্মযোগী মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্পর্কে খুব বেশি বা উল্লেখযোগ্য লেখা আমার হাতে এসে পৌঁছোয়নি। অনেকদিন থেকেই মনের কোণে একটি সুপ্ত বাসনা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল এই মহান ব্যক্তিসম্পর্কিত কিছু তথ্য বা লেখা প্রকাশ করার। কিছুটা সময়ের অভাবে এবং অনেকখানিই উদ্যোগের অভাবে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

খুব ছোটোবেলায় পড়েছি,

"পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিলো

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।”

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা এই কবিতা আবৃত্তি করতে হতো আমাদের বাল্যকালের শিক্ষাজীবন। তখন থেকেই যেন কবির প্রতি আলাদা আকর্ষণ অনুভব করতাম। তারপর গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং শিক্ষকজীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে বিল্বগ্রামের মদনমোহন মেলায় গিয়ে মনে হয়েছিল এই মহৎ মানুষটি কেন আজও উপেক্ষিত? কেন তাঁর উপর বিস্তৃত আলোচনা থেকে বঞ্চিত বাংলার এই বিশেষ ব্যক্তিত্ব? আমার শিক্ষকতার আঙিনা থেকে বিল্বগ্রামের দূরত্ব মাত্র ছয় কিলোমিটার। মদনমোহন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানার জন্য বারংবার বিল্বগ্রামে গিয়েছি। বিভিন্ন সময়ে সেখানকার সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে তাঁর (মদনমোহনের) বংশধরদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর সম্বন্ধে বহু অজানা তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। তাতে আমার উপলব্ধি হয়েছে প্রকৃতই বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর অবদান, সমাজ সংস্কারে তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগ বর্তমান প্রজন্মের কাছে বহুলাংশে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। তাই আমার ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে এসেছি বিষয়টির কিছুটা হলেও জিজ্ঞাসু সমাজের কাছে তুলে ধরার মানসিকতা নিয়ে। পরম নিষ্ঠাবান শিক্ষাপ্রেমী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পুণ্য জন্মভূমি বিল্বগ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত মুড়াগাছা উচ্চ (উচ্চ মাধ্যমিক) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে একাজ আমার দায়বদ্ধতার মধ্যে কিছুটা পড়ে বলেই মনে করি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার আমাদের এই ঐতিহ্যময় বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মদনমোহনের বাড়িতে। যাওয়ার সময় তিনি দশ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন আমাদের এই বিদ্যালয়কে। তখন থেকেই আমাদের বিদ্যালয়ের

শুভযাত্রা শুরু। তাই হৃদয়ের গভীরে প্রশ্নটা ছিল যে যদি মদনমোহন পাশের গ্রামে (বিল্বগ্রামে) না জন্মগ্রহণ করতেন তা হলে ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আসতেন না—আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর না আসলে আমাদের মুড়াগাছা মাল্টিপারপাস উচ্চ (উ: মা:) বিদ্যালয় তৎকালীন যুগে দশ টাকা পেতও না। তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল সেই শ্রদ্ধা মদনমোহনের প্রতিও ছিল আর এই শ্রদ্ধাবোধই আমাকে তাঁর (মদনমোহন তর্কালঙ্কার) জীবনকাহিনি প্রকাশের অভিপ্রায়ে অনেকটা একটা ছোটো কলসির মধ্যে বিশাল এক দীঘির জলকে পোরার মতোই প্রায় অসম্ভব কাজে হাত দিয়েছি। যতটা পেরেছি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মানুষ যাতে বিন্দুতে সিন্ধুর মতো কিছুটা তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারে। সেই অনুষঙ্গে আমার এই প্রচেষ্টা। এই জীবনকাহিনির প্রবাহে অবগাহন করে পাঠক-সাধারণের আত্মশুদ্ধি হলে আমার শ্রম কিছুটা সার্থক বলে মনে করব।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, এত প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তেমনভাবে তর্কালঙ্কার মহাশয় যথাযথ প্রচারের আলোয় আসতে পারেননি। বিদ্বৎসমাজে অনেকটা ব্রাত্যই থেকে গেলেন তিনি। বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর অসামান্য অবদান অনালোকিত থাকলে সেই ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই তমসাচ্ছন্ন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িককালে জন্মগ্রহণ করে এবং জ্ঞান গরিমার দিক থেকে সমপর্যায়ভুক্ত হয়েও তিনি প্রায় অচেনা অজানা রয়ে গিয়েছেন সমাজে। তাই নদিয়ার বিল্বগ্রামে মহামানব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম, শিক্ষা ও কর্মময় জীবনের নানাদিক স্বল্পপরিসরে তুলে ধরার মানসে এত বড়ো দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছি। তাই লেখার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকবে—এটা ধরে নিয়েই কাজে অগ্রসর হয়েছি। এই গ্রন্থ পাঠ করে পাঠকের মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা

জাগবে এবং তাঁরা তর্কালঙ্কারের বিষয়ে আগ্রহী হবেন—এই আমার প্রত্যাশা। যারা আমায় এই বইটি লিখতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে আমার জ্যাঠামশায় শঙ্করীভূষণ নায়কের কথা। যিনি আমাকে পিছন থেকে সাহায্য না করলে এই বইটি লেখা সম্ভবপর হত ন। আমার স্ত্রী বীথিকা সিংহরায় (প্রধান শিক্ষিকা, ধর্মদা সুশীলাবালা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়) আমার সঙ্গে বারংবার বিল্বগ্রামে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। সাহায্য পেয়েছি নির্মল রায়ের লেখা পুস্তকটি থেকেও। আমার ছাত্র সন্দীপ কুমার সরকার (রানা) কে কোনোমতেই ভুলব না, কম্পিউটার এডিটিং ও প্রিন্টিংয়ের কাজে বারংবার সাহায্য করার জন্য। তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিমলেন্দু সিংহরায

॥ এক ॥

"একজন মহৎ কবি হবার জন্য অবশ্যই তোমাকে একজন মহৎ মানুষ হতে হবে" সমালোচক টেনির এই বক্তব্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতো ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনের প্রকাশ। তাঁর ভালোবাসা, তাঁর আশা- আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, আবেগ, তাঁর আনন্দ, বেদনা, ক্রোধ হতাশা। আর সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বাংলার জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর সীমাহীন অনুরাগ। এই প্রতিবাদী কবি, এই ভালোবাসার কবির নাম মদনমোহন তর্কালঙ্কার। যে সমস্ত মানুষ তাদের ব্যক্তিত্ব, কৃতিত্ব, কর্মপন্থা, অপরিসীম সাহস ও শক্তি দিয়ে সমাজের ও প্রশাসনের গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন মদনমোহন তাদের মধ্যে একজন। বিল্বগ্রামের পল্লিপ্রকৃতি, দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, সবুজ শস্যখেত আর নীল আকাশ তাঁকে যেন কবি হতে সাহায্য করেছিল। কিশোর বয়সেই তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল

প্রকৃতির প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ। ধানের উপর শিশির ভেজার গন্ধ তাকে ভাবাত, প্রজাপতি-ফড়িং-জোনাকির চলাফেরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি। সুন্দরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল গভীর। তাঁর পিতামাতা উপলব্ধি করতে পারতেন মদনমোহনের ভক্তিমিশ্রিত কর্তব্যবোধ। এই গুণগুলিই তো মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলে। মদনমোহনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর ছাত্রজীবনে মনে ও মননে ঘটেছিল এক সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রকাশ। যে প্রকাশের জন্য তাকে সকলেই ভালোবাসত। সৌন্দর্যচেতনা শাস্ত্রপাঠ করে অনুশীলন করা যায় না। মানুষের জীবনচর্যা ও সহজাত প্রকাশভঙ্গির অনুষঙ্গে ফুটে ওঠে অন্তরের আবেগ। আর এই অন্তরের আবেগ তিনি অনুভব করতেন তাঁর মানস চোখ-কানের মধ্য দিয়ে। তাঁর পিতা ছেলের সম্ভাবনার লক্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সেই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর জন্য স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের।

ভারত ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে কবির আবির্ভাব। পলাশির প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজেই নিয়োজিত ছিল। তারপর শুরু হয়েছিল তাদের রাজ্যবিস্তার। ভেঙে পড়ল নয়শো বছরের মুঘল সাম্রাজ্যের সৌধ। "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।" ইংরেজরা শুধু বন্দুক হাতে আসেনি। তাঁরা নিয়ে এসেছিল ইংরেজি ভাষা, পশ্চিমের জ্ঞান, চিন্তা।

এদেশের মানুষ মধ্যযুগে বিচিত্র অমানবিক ধর্মাচরণ করত আর কুসংস্কারের হাজার নিয়মের বেড়াজালে নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছিল। নতুনকে গ্রহণ করতে তাদের যেমন ছিল ভয় তেমনি

দ্বিধা। প্রকৃতপক্ষে এ এক প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এই যুগের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং তাঁর মতো উন্নত সামাজিক চিন্তাধারার কয়েকজন মানুষ। তখন বাংলাভাষার তেমন শ্রীবৃদ্ধি হয় নি। ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সক্রিয় ব্যক্তিত্বের অভাবে বাংলাভাষা ছিল নিতান্তই অপরিণত। প্রকৃতপক্ষে তখন সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। প্রধানত তাঁরাই সমাজে কুসংস্কার বীজ উপ্ত করেন। তখনই প্রাচীন যুগের বাংলার সংস্কৃতি ক্রমে অপসংস্কৃতির রূপ নেয়। ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণ আচার-আচরণ এবং বহুবিধ নিয়মের অন্তরালে কুসংস্কার মদনমোহন কোনো দিন মেনে নিতে পারেননি। বাংলার দিকে দিকে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ আর সহ-মরণের মতো কু-প্রথা প্রচলিত। সে যেন এক স্ত্রী-শিক্ষা বর্জিত, বাল্য-বিধবাদের অবর্ণনীয় লাঞ্ছনায় তমসাচ্ছন্ন যুগ। জাতপাতের বিভাজন, ধনী দরিদ্রের আর শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভেদাভেদ প্রভৃতির ফলে সমাজ শৃঙ্খলাহীন। হিন্দু কলেজের তখন শৈশব অবস্থা, লড়াই চলছে সহমরণপ্রথা ও প্রতিমা পুজোর বিরুদ্ধে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ নিজেদের যাবতীয় কুসংস্কার বজায় রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে দারুণ আগ্রহী। মিশনারিরা উঠে পড়ে লেগেছে ছলে-বলে কৌশলে ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণ করবার জন্য। এরকমই সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পথ চলা শুরু।

চাকরিসূত্রে মদনমোহন তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখেছেন অজ্ঞান আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মিছিল, ধর্মের ভণ্ডামি, বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, নারীর উপর অকথ্য নির্যাতন। তাঁর যুক্তিবাদী মন কিছুতেই এইসব সামাজিক কু-প্রথা মেনে নিতে পারেনি। সমস্ত প্রকারের সামাজিক

অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল তীব্র ক্ষোভ আর ঘৃণা। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে দেশের সমস্ত মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে। তাঁরা জানতো না গীতা, বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী।

মদনমোহন স্থির করলেন শিশুদের কাছে খুব সহজ ও সরলভাবে তিনি বেদ ও উপনিষদের মর্মবাণী তুলে ধরবেন। শুধু কী তাই ভারতীয় নারীদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। জনজাতির প্রতি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার আঙিনায় সকলের বিচরণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ সমাজের উচ্চবর্ণের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় মদনমোহনের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তাঁরা ঢাক ঢোল নিয়ে মদনমোহনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন এবং তাকে দৈহিক শাস্তি দেবার জন্য তৎপর হলেন। সামাজিকভাবে তাঁর এই কাজের বিরোধিতা করার সবরকমের ব্যবস্থা করলেন তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতিরা। একদিকে গোঁড়া সমাজপতিদের বিরোধিতা, অন্যদিকে কুসংস্কার প্রথা-এই দুইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ় চিত্তে যাঁরা তৎকালীন সমাজে লড়াই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্মরণীয় নাম—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সেই যুগে, সেই পরিবেশে দাঁড়িয়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় যে কোথা থেকে এত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। রামমোহনের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ মদনমোহন তর্কালঙ্কার উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের উন্নতি করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথাকে অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে

চারিদিকে তীব্র প্রতিবাদের হুঙ্কার দিয়েছিলেন তৎকালীন সমাজপতিরা। তারা সোচ্চার হয়ে বড়োলাটের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। এদের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদের দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরাও কিন্তু কোনো অংশে কম ছিলেন না। সেই অসংখ্য মানুষের মধ্যে যাঁদের বক্তব্য তৎকালীন সময়ে আকর্ষণ করত তাঁদের অন্যতম হলেন শিশুশিক্ষার অগ্রপথিক কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মদনমোহনের সাবলীল ব্যক্তিত্ব, তাঁর জ্ঞান, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার প্রকাশের কারণে খুব ছোটোবেলা থেকেই তিনি তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দেহের লাবণ্য, সুমধুর কণ্ঠস্বর আর সহৃদয় ভালোবাসা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন শান্ত, একাগ্র কর্মনিষ্ঠ এবং ধীর স্বভাবের। প্রকৃতির মধ্যেই যেন তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছপালা, নদ-নদী, পশু-পাখি আর বিভিন্ন পরিবেশের জনজাতি চেনার ও জানার কৌতূহল তাঁর বাল্যকাল থেকেই ছিল। প্রকৃতির মধ্যে মানবসত্তার অপূর্ব প্রকাশ তাঁর কাব্যের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতির সব কিছুর প্রতিই ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। মানুষ আর প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ থাকলেও ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে চেতনা বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা তাঁর চরিত্রে অনুপস্থিত। তিনি মনে করতেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ নয়, মানুষই একদিন সমস্ত কিছু জয় করতে পারবে। এই নদিয়ার বুকেই ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীলবিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ শাসনের সেই বিকৃত রূপ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার।